ইউনিট- ৯

মাছ চাষ

ভূমিকা

বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দিঘি, পুকুর, ডোবা ও জলাশয়। কোন কোন জলাশয় বছরের অধিকাংশ সময় পতিত থাকে। একটু চেষ্টা করলেই এসব জলাশয়ে সহজে মাছ চাষ করা যায়। আমাদের দেশে মাছ চাষ বলতে পুকুরে মাছ চাষকেই বুঝায়। দেশে অধিকাংশ পুকুরেই নিয়ম অনুযায়ী মাছ চাষ করা হয় না। আবার সব পুকুরে সব রকম মাছ চাষ করা যায় না। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ২৭৫ টি স্বাদু পানির মাছ পাওয়া যায়। প্রজাতির সব মাছ পুকুরে চাষ করা যায় না। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাছ দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কমে গেছে। পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

এ ইউনিট শেষে আপনি– ● মৌসুমী পুকুরে এবং ● স্থায়ী পুকুরে মাছ চাষ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পাঠ-৯.১ : মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের সুবিধা উলে- খ করতে পারবেন।
- নাইলোটিকা, রাজপুঁটি ও দেশী মাছ (শিং, মাগুর) চাষ পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন।

অনেক পুকুর আছে যেখানে শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকে না, সেগুলোকে মৌসুমী পুকুর বলে। অর্থাৎ বছরে ৩-৮ মাস পানি থাকে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ জাতীয় অসংখ্য পুকুর আছে। উপযুক্ত ব্যবহারের অভাবে এসব পুকুর পড়ে থাকে। অনেক ছোট জাতের মাছ এসব জলাশয়ে বা পুকুরে খুব সহজে চাষ করা যায়। যেমন– রাজপুঁটি নাইলোটিকা, দেশী শিং, মাগুর ইত্যাদি।

মৌসুমী পুকুরে মাছ চাষের সুবিধা

- পারিবারের বাড়তি আয় হয়।
- আমিষের চাহিদা পূরন হয়।
- গ্রামীন মহিলারাও সহজে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- অল্প সময়ে অল্প পুঁজিতে মাছ চাষ করা যায়।
- পতিত জলাশয় চাষাবাদের আওতায় এনে পরিবেশ ভালো রাখে
- রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট অংশ খাবার হিসেবে পুকুরে দেয়া যায়।

চাষ পদ্ধতি

পুকুরে মাছ চাষ আরম্ভ করার পূর্বে পুকুর প্রস্তুত করতে হয়। পূর্বের ইউনিটে পুকুর প্রস্তুতির নিয়মাবলি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপ ধাপগুলি বর্ণনা করা হলো–

ক. আগাছা পরিষ্কার।

খ. রাক্ষুসে মাছ ও আগাছা অপসারণ।

গ. পাড় ও তলা মেরামত।

ঘ. চুন ও সার প্রয়োগ।

ঙ. পানি সরবরাহ।

চ. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা।

এ ধাপগুলোকে পোনা মজুদ পূর্ব ব্যবস্থাপনাও বলা যায়।

ক. আগাছা পরিষ্কার

আগাছা পুকুরে ব্যবহৃত সার থেকে পুষ্টি শোষণ করে। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রাক্ষুসে মাছের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নিচের যে কোন একটি পদ্ধতির মাধ্যমে আগাছা পরিষ্কার করা যায়-

১. কায়িক শ্রম দ্বারা

দেশের বেকার শ্রমজীবী মানুষকে সহজেই এ কাজে লাগানো যায়। কচুরিপানা, হেলঞ্চা, কলমিলতা ইত্যাদি সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

২. জৈব পদ্ধতিতে

গ্রাসকার্প ও রাজপুঁটি উদ্ভিদভোজী মাছ। এসব মাছ পুকুরে মজুদ করলে আগাছা খেয়ে সহজেই পুকুর পরিষ্কার করে ফেলে।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে

মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য সবুজ শেওলা পুকুরে অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। শতাংশ প্রতি ১ মিটার গভীরতার পানির জন্য ৩৫ গ্রাম কপার সালফেট (তুঁতে) প্রয়োগ করে অতিরিক্ত সবুজ শেওলা দূর করা যায়।

খ. রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণ

এসব মাছ পুকুরে চাষকৃত মাছের পোনা ও খাবার খেয়ে ফেলে। তাই মাছ চাষের শুরুতে এসব মাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। নিচের যে কোন একটি পদ্ধতির দ্বারা রাক্ষুসে মাছ অপসারণ করা যায়।

১. পুকুর শুকনো

রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের জন্য পুকুর শুকনো প্রয়োজন। পাম্প মেশিনের সাহায্যে পুকুর সেচে ফেলতে হয়। তারপর পুকুরের তলায় চাষ দেয়া ভালো। এতে ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস হয়, উৎপাদনশীলতা বাড়ে।

২. জাল টেনে

পুকুরে পানি কম থাকলে বার বার জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দূর করা যায়। জালের নিচের অংশে ইট বা ভারী কিছু বেঁধে আস্তে আস্তে জাল টানতে হয়।

৩. রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ

অনেক সময় পুকুর শুকানো সম্ভব হয় না। আবার জাল টেনেও সব রাক্ষুসে মাছ অপসারণ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রোটেনন, ফসটক্সিন, ব্লিচিং পাউডার নির্দিষ্ট মাত্রায় পুকুরে দিতে হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মাত্রা দেয়া হলো :

দ্রব্যের নাম	**ব্যবহার মাত্রা/শতাংশ**
রোটেনন	৩০-৩৫ গ্রাম
ফসটক্সিন	৩ গ্রাম (১টি টেবলেট)
ব্লিচিং পাউডার	১০০ গ্রাম

রোটেনন বা ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিলে ১ ঘণ্টা পর মাছ পানির উপর ভাসতে শুরু করে। তখন বার বার জাল টেনে মাছ তুলে ফেলতে হয়। রোটেননের বিষাক্ততার মেয়াদ ৭ দিন। রোটেনন দিয়ে মারা মাছ খাওয়া যায়।ব্লিচিং পাউডার দিলে পুকুরে চুন দিতে হয় না। ফসটক্সিন টেবলেট সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

গ. পাড় ও তলা মেরামত

পাড় ভাঙা থাকলে বর্ষাকালে পুকুরের মাছ বাইরে চলে যেতে পারে আবার রাক্ষুসে মাছ পুকুরে ঢুকতে পারে। তাই শুকনো মৌসুমে ভাঙা পাড় মেরামত করে তাতে ঘাস লাগালে পাড় শক্ত হয়। তলা অসমান থাকলে জাল টানতে অসুবিধা হয়। সেজন্য কোদাল বা লাঙল দিয়ে তলদেশ সমান করতে হয়। তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। পুকুরের পরিবেশ যথাযথ রাখার জন্য ১৫-২০ সে.মি. কাদা রেখে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হয়।

ঘ. চুন ও সার প্রয়োগ

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট চুন ও সার দিতে হয়। চুন মাটির অম্ল ও ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। মাটি ও পানির উর্বরতা শক্তি বাড়ায়। পানিতে উদ্ভিদকণা ও আধিক্যের উপর পুকুরের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। উদ্ভিদকণার আধিক্যের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম প্রয়োজন। অজৈব সার (ইউরিয়া, টি.এস.পি) ও জৈব সার (গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, সবুজ সার, কম্পোস্ট) ব্যবহারে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মে।

ঙ. পানি সরবরাহ

পুকুরে যদি প্রাকৃতিকভাবে পানি না জমে তবে মেশিনের সাহায্যে পানি ঢুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পুকুরে চুন, সার ও পানি সরবরাহের সাতদিনের মধ্যে প্রাকৃতিক খাদ্য জন্ম নেয়। পর্যাপ্ত খাদ্যসমৃদ্ধ পানির রং হাল্কা সবুজ বা বাদামি হয়। দুটি পরীক্ষার দ্বারা প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি বোঝা যায়–

১. গ্লাস পরীক্ষা

সার ব্যবহারের ৫-৭ দিন পর স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পুকুরে পানি নিতে হবে। সূর্যের আলোতে যদি গ্লাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদকণা ও প্রাণিকণা দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

২. হাত পরীক্ষা

নিজের হাত কনুই পর্যন্ড় পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হাতের তালু দেখুন। হাতের তালু দেখা না গেলে বুঝতে হবে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে। হাতের তালু দেখা গেলে পুনরায় সার দিতে হবে।

সরপুঁটির চাষ

সরপুটি মাছ খুব শক্ত প্রাকৃতির, সুস্বাদু, সহজে রোগাক্রান্ত হয় না। মাত্র ৩ মাসে খাওয়ার এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়।

পোনা মাছ মজুদ

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষার পর যখন পানির রং সবুজ হবে, তখনই পুকুরে সরপুঁটি মাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে। শতাংশ প্রতি ৮-১০ সে.মি. আকারের ৬০-৮০ টি সরপুঁটির পোনা অবমুক্ত করতে হবে। পোনা অবমুক্ত করার আগে পোনার ব্যাগটি আধ ঘণ্টা পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর পোনার ব্যাগটি কাত করে আস্তে আস্তে পুকুরের পানি ব্যাগে এবং ব্যাগের পানি পুকুরে দিতে হবে। এভাবে ধীরে ধীরে যখন পোনার ব্যাগের পানির তাপমাত্রা এবং পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। তখন পোনার ব্যাগটি পুকুরে কাত করে ধরলে সমস্ত পোনা পুকুরে চলে যাবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পর তার পরিচর্যা প্রয়োজন।

পোনার পরিচর্যা

পোনা ছাড়ার পরদিন থেকেই প্রতিদিন পুকুরে যে পরিমাণ মাছ আছে তার শারীরিক ওজনের শতকরা ৩-৪ ভাগ হারে চালের কুঁড়ো দিতে হবে। তার কয়েকদিন পর অর্থাৎ ৮-১০ দিন থেকে সব ধরনের খাবার পুকুরে সরবরাহ করা যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

মাছ খাবার ঠিকমত খাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি দেখা যায় সকালে মাছ পানির উপরের দিকে মুখ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে তখন বুঝতে হবে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

মাসে দুবার জাল বা পাতলা কাপড় টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। মাছের পোনায় রোগ-বালাই হলে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেনের তীব্র অভাব হলে পুকুরে খাবার ও সার দেয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া বাঁশ বা লাঁঠি দিয়ে পানিতে আঘাত করে, ঘনঘন জাল টেনে বা পুকুরে সাঁতার কাটলে অক্সিজেনের অভাব দূর হবে।

মাছ আহরণ

পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে সরপুঁটি মাছ ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের হয়ে যায়। তখন টানা বেড় জাল দিয়ে মাছ আহরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করার জন্য পুকুর সেচে ফেলতে হবে। মাছ আহরণের কাজ ভোররাত থেকে সকাল ৮-৯টা পর্যন্ত করা যায়। এ সময় মাছগুলো বিক্রি করলে মূল্যও ভালো পাওয়া যাবে।

নিচে ২০ শতাংশের একটি পুকুরে ৫-৬ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখান হলো :

উপকরণ	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
পুকুর শুকানো বা সংস্কার	.....	৫০০.০০
চুন	২০ কেজি	১০০.০০
গোবর	৫০০ কেজি	১৫০.০০
ইউরিয়া, টি, এস, পি	৬ কেজি	৩০.০০
পোনা (পরিবহনসহ)	১৬০০ টি	৩২০.০০
চালের কুঁড়া	৯০ কেজি	১৩৫০.০০
জালটানা	.....	১০০.০০
প্রকৃত ব্যয়	.....	২,১১০.০০

মাছ বিক্রিয় ১৬০ কেজি প্রতি কেজি ৪০ টাকা হারে = ৬,৪০০ টাকা

প্রকৃত লাভ ৬,৪০০-২,১১০ = ৪,২৯০ টাকা।

দেশী মাছ চাষ : মাগুর, শিং, কৈ, মাছকে আমাদের দেশী মাছ বলা হয়। এ মাছগুলো খুব সুস্বাদু। এসব মাছের পুষ্টিমান বেশি। রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিকভাবে খাল, বিল, ডোবায় এ জাতীয় মাছ প্রজনন করে। বাজারে এসব মাছের প্রচুর চাহিদা আছে।

চাষ প্রাণালী : ছোট বড় সবধরনের পুকুরেই শিং-মাগুর মাছ চাষ করা যায়। তবে অগভীর ছোট পুকুরেই এসব মাছ চাষের জন্য ভালো। পুকুরের পাড় খাড়া হওয়া ভালো। পুকুর পাড়ে ৩০ সে.মি. ইটের খাড়া দেয়াল বা বাঁশের বেড়া দিলে ভালো। অন্যান্য মাছ চাষের মতই পুকুর প্রস্তুত করতে হয়। শতাংশ প্রতি ১০০-১২৫ টি পোনা ছাড়া যায়। সাত দিন পর পর শতাংশ প্রতি ১ কেজি গোবর দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্য

এসব মাছ আমিষ জাতীয় খাদ্য পছন্দ করে। তাই চালের কুঁড়ো, সরিষার খৈল, ফিশমিল, গবাদিপশুর রক্ত নাড়িভূড়ি, শামুক, ঝিনুক ও গমের ভুষি সম্পূরক খাদ্য হিসাবে দেওয়া যায়। মাছের দেহের মোট ওজনের ৩-৫% হারে প্রতিদিন খাবার দিতে হয়। তবে ২ মাস পর থেকে গরু-ছাগলের নাড়িভুড়ি কেটে দেয়া যায়। ঘরের উচ্ছিষ্ট খাবার জমিয়ে রেখে পুকুরে দেয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ ও পরিচর্যা করলে ৫-৬ মাসে একটি মাগুর ১৫০-২০০ গ্রাম এবং শিং মাছ ১০০-১২৫ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

মৌসুমী পুকুরে শিং ও মাগুরের চাষ করলে বছরে দুবারে মাছ চাষ করা যায়। প্রতি ফসলে হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন মাছ পাওয়া যায়।

সারমর্ম

- পুঁটি, নাইলোটিকা, শিঙ ও মাগুর অল্প সময়ে অল্প খরচে চাষ করা যায়।
- পানির রং বাদামি সবুজ বা হাল্কা সবুজ হলে বুঝতে হবে পানিতে প্রাকৃতিক খাবার আছে।
- সকাল ও সন্ধ্যায় পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়।
- প্রতিদিন সকাল ও বিকালে মাছকে খাবার দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কিসের অভাবে মাছ মুখ হাঁ করে থাকে?
(ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন
(গ) চুন (ঘ) কার্বন ডাই-অক্সাইড

২। গবাদি পশুর রক্ত কোন মাছকে খাবার হিসাবে দেয়া যায়?
(ক) নাইলোটিকা (খ) রাজপুঁটি
(গ) গ্রাসকার্প (ঘ) মাগুর

৩। নাইলোটিকা কত মাস বয়সে বাজারজাতকরণের উপযোগী হয়?
(ক) ৩ মাস (খ) ৬ মাস
(ঘ) ৮ মাস (ঘ) ১০ মাস

পাঠ-৯.২ : মজুদ পুকুরে মাছ চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মজুদ পুকুরে মাছ চাষ করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মিশ্র চাষ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

মজুদ পুকুরে ৮-১২ সে.মি. আকারের পোনা ছেড়ে খাওয়ার উপযোগী করা হয়। এ মাছ বাজারে বিক্রি করা হয়। মজুদ পুকুরকে বড় মাছের পুকুরও বলা হয়। মাছ চাষ মূলত কৃষির মতই চাষাবাদ পদ্ধতি। কোন জলাশয়ে বা পুকুরে প্রাকৃতিক উপায়ে যে মাছ উৎপাদিত হয় তা মাছ চাষ।

সাধারণভাবে মজুদ পুকুরে মাছ চাষ পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

২। আধা–নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

৩। নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

নিচে এসব পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো–

সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষ : এ পদ্ধতিতে পুকুরের কোন ব্যবস্থাপনা ছাড়াই, মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় পানিতে যে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় মাছ তাই খেয়ে জীবন ধারণ করে। পোনা ছাড়ার সময় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সঠিক সংখ্যায় ছাড়া হয় না এবং কোন পরিচর্যাও করা হয় না।

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ : এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার কিছুটা উন্নয়ন ঘটানো হয়। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পুকুর প্রস্তুত করে আংশিক সার ও খাদ্য সরবরাহ করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন করা হয়। পুকুরের বিভিন্নস্তরে উৎপাদনের জন্য সার ব্যবহার করে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো হয়।

নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ :বাহির থেকে উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের যথাযথ সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে চাষ করা হয় তাকে নিবিড় পদ্ধতির মাছ চাষ বলে। এ পদ্ধতিতে প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়। তাই সনাতন ও আধা-নিবিড় পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতিতে পুকুরের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন করা যায়।

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ

রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশ, বিগহেড, সিলভার কার্প, কমন কার্প ইত্যাদিকে কার্প জাতীয় মাছ বলা হয়। এসব প্রজাতির মাছ পুকুরের বিভিন্ন স্তর থেকে খাবার খায়। তাই বিভিন্ন স্তরে উৎপন্ন খাবার সম্পূর্ণ ব্যবহার করার জন্য নানা প্রজাতির মাছ একত্রে চাষ করা হয়। এরূপ চাষ করাকে মিশ্র চাষ বলা হয়। এ ধরনের মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন–

১। উর্বর মাটি ও পানি;

২। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস;

৩। সুস্থ আলো-বাতাস;

৪। সার;

৫। সম্পূরক খাদ্য;
৬। সুষ্ঠু পরিচর্যা।
মাছ চাষের বিভিন্ন পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :
১। পুকুর নির্বাচন;
২। পুকুর প্রস্তুতকরণ;
৩। পোনা মজুদ;
৪। সার প্রয়োগ;
৫। সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ;
৬। সুষ্ঠু পরিচর্যা;
৭। মাছ আহরণ;

১। পুকুর নির্বাচন : পুকুর নির্বাচনের সময়, স্থান, মাটি গুণাগুণ, আকার ও গঠন, পানির গভীরতা ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ক. পুকুরের স্থান : পুকুরের জন্য খোলামেলা স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাড়ির আশেপাশে হলে ভালো হয়। তাহলে সার ও খাবার সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করতে সুবিধা হবে। পুকুর যথাসময় বন্যামুক্ত এলাকায় নির্বাচন করা উচিত। কারণ আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছরেই বর্ষণ ও বন্যায় পুকুর ভেসে যায়। এতে চাষকৃত মাছ বন্যার পানিতে বেরিয়ে যায়।

খ. মাটির গুণাগুণ : মাটির গুণাগুণ পুকুরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– লাল ও এঁটেল মাটির পুকুরের পানি ঘোলা হয়। ঘোলা পানির উৎপাদনশীলতা কম। আবার মাটি যদি বেলে হয় তাহলে শুকনো মৌসুমে পানি থাকে না। সাধারণত দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ ও এঁটেল মাটি পুকুরের জন্য ভালো।

গ. পুকুরের আয়তন : পুকুর যে কোন আয়তনের হতে পারে। তবে কমপক্ষে ২০ শতাংশ হতে হবে। ২০ শতাংশ থেকে ১ একর আকারের পুকুর বেশি উপযোগী।

ঘ. পানির গভীরতা : মাছ চাষের জন্য পুকুরের গভীরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানির গভীরতা বেশি হলে সূর্যের আলোর অভাবে পুকুরের তলদেশে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়। আবার কম গভীর হলে পুকুরের পানি বেশি গরম হয়ে যায়, এতে মাছের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। পুকুরের গভীরতা ২-২.৫ মিটার গভীরতা বেশি হলে সূর্যের আলোর অভাবে পুকুরের তলদেশে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়। আবার কম গভীর হলে পুকুরের পানি বেশি গরম হয়ে যায়, এতে মাছের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। পুকুরের গভীরতা ২-২.৫ মিটার রাখা ভালো।

ঙ. পরিবেশ : পুকুর পাড়ে বড় গাছ বা ঝোপ থাকা উচিত নয়। বড় গাছের পাতা পড়ে পুকুরের পানি নষ্ট হতে পারে। বড় গাছ পুকুরে সূর্যের আলো পড়তে বাধার সৃষ্টি করে। ঝোপঝাড়ে মৎস্যভুক ও ক্ষতিকর প্রাণী বসবাস করতে পারে।

২। পুকুর প্রস্তুতি: চাষাবাদের জন্য ফসলের জমি যেমন প্রস্তুত করতে হয় মাছ চাষের জন্য তেমনি পুকুর প্রস্তুত করতে হয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পুকুর প্রস্তুতি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ

পুকুরে মাছ চাষ করতে হলে জলজ উদ্ভিদের প্রয়োজন আছে। জলজ উদ্ভিদেই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। কিন্তু কোন কোন জলজ উদ্ভিদ অতিরিক্ত পরিমাণে জন্মালে তা মাছের ক্ষতিকর। তাই জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। সাধারণত চারটি উপায়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

নিচে এর বর্ণনা দেয়া হলো :

ক. কায়িক শ্রম দ্বারা

শ্রমিক নিয়োগ করে হাত দিয়ে জলজ উদ্ভিদ শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। উপড়ানো আগাছাগুলো এক জায়গায় একটি গর্তের মধ্যে পচিয়ে সবুজ সার হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা হবে।

খ. জৈব প্রক্রিয়া

গ্রাস কার্প ও থাই সরপুঁটি উদ্ভিদভোজী মাছ। এসব মাছ পুকুরে ছাড়লে পুকুরে আগাছা খেয়ে পানিতে মলত্যাগ করে। এই মল পানিতে পচে অন্য মাছের খাদ্য উৎপাদনে সাহায্যে করে। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন বিনা খরচে আগাছা নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যদিকে মাছের ফলনও অনেকাংশ বৃদ্ধি পায়।

গ. রাসায়নিক প্রক্রিয়া

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য যেমন– ২-৪ ডাইক্লোরোবেনজিন, এ্যাকুয়াথল ইত্যাদি ব্যবহার করে জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শেওলাজাতীয় উদ্ভিদের অপসারণ করার জন্য কপার সালফেট বা তুঁতে ব্যবহার করা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিগ্রাম কপার সালফেট ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। অতিরিক্ত কপার সালফেট মাছের জন্য বিষাক্ত।

ঘ. পুকুর সেচের মাধ্যমে

পুকুর সেচ দেয়া সম্ভব হলে সেচকৃত পুকুরের তলদেশের কাদা কিছু পরিমাণ তুলে ফেলতে হয়। এটি আগাছা পরিষ্কারের সর্বোত্তম পদ্ধতি।

রাক্ষুসে প্রাণী এবং অবাঞ্চিত মাছ অপসারণ

যেসব পুকুরে রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ ও প্রাণী রয়েছে সেসব রাক্ষুসে প্রাণী ও মাছ দমন করতে হবে। সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী। বোয়াল, টাকি, গজার ও ফলি ইত্যাদি রাক্ষুসে মাছ এবং চেলা, চান্দা ও ডানকিনা ইত্যাদি অবাঞ্চিত মাছ। এরা পুকুরে থাকলে চাষযোগ্য পোনা খেয়ে ফেলে অথবা পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে নেয়। কাজেই এদের দমন করতে হবে। সাধারণত তিন উপায়ে এদের অপসারণ করা যায়।

ক. পানির সেচের মাধ্যমে।

খ. জাল টেনে।

গ. বিষ বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে।

রাক্ষুসে মাছ অপসারণের উপায়

পুকুর শুকনো

পুকুরের সমস্ত পানি সেচ দিয়ে ফেলে সকল মাছ ধরে ফেলা যায়। পুকুর শুকনোর পর তলদেশ প্রখর রোদে কমপক্ষে এক সপ্তাহ শুকাতে হবে। যাতে কাদার মধ্যে মাছ লুকিয়ে থাকতে না পারে। ফাল্গুন থেকে বৈশাখ র মধ্যে মাসে এ কাজটি করা সবচেয়ে ভালো।

জাল টেনে রাক্ষুসে মাছ দমন

যেসব পুকুরে রাক্ষুসে মাছ কম এবং পানির গভীরতা কম সেখানেই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা যায়। জাল টানার সময় জালের ফাঁক দিয়ে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। সেজন্য জালের তলার অংশে ভারী বস্তু যেমন– ইট ঝুলিয়ে খুব আস্তে আস্তে টানতে হয়।

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার

অনেক সময় জাল টেনে সব মাছ ধরা যায় না। আবার পুকুর শুকনো হলে পুনরায় পানি সরবরাহের অসুবিধা থাকতে পারে। তাই বর্তমানে ব্লিচিং পাউডার, রোটেনন, ফসটক্সিন ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে রাক্ষুসে মাছ দমন করা হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মাত্রা দেওয়া হলো :

রাসায়নিক দ্রব্য	পানির আয়তন (শতাংশ)	পানির গড় গভীরতা	ব্যবহার মাত্রা
ব্লিচিং পাউডার	১	৩০ সে.মি.(১ফুট)	৯০০ গ্রাম পাউডার
রোটেনন	১	৩০ সে.মি.(১ফুট)	৩৫ গ্রাম পাউডার
ফসটক্সিন	১	৩০ সে.মি. (১ফুট)	১ টি ট্যাবলেট

রোটেনন বা ব্লিচিং পাউডার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। ফসটক্সিন ট্যাবলেট সমানভাবে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হয়। এসব ওষুধ প্রয়োগের ১-২ ঘণ্টা পর জাল টেনে দিলে তাড়াতাড়ি কার্যকর হয়। ওষুধের বিষক্রিয়া প্রয়োজন হয় না। রোটেনন ও ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগে করার পর যেসব মাছ মারা যায়, তা খেলে ক্ষতি হয় না। তবে ফসটক্সিন প্রয়োগ মাছ না খাওয়াই ভালো। পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ অপসারণের পর চুন ব্যবহার করতে হয়। চুন পুকুরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় উপাদান।

- চুন মাছের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে।
- ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস করে।
- চুন পানি ও মাটির অম্লত্ব দূর করে।

প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। যদি পুকুরে পানি থাকে তবে ড্রাম বা বালতিতে গুলে ঠান্ডা করে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগের নিয়ম :

বালতি বা ড্রামের মধ্যে অথবা পুকুরের পাড়ে গর্ত করে পানিতে চুন ভেজাতে হবে। কিছুক্ষণ পরে চুন ফুটে ঠান্ডা হয়ে গেলে পানি মিশ্রিত চুন সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগে পুকুরে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপন্ন হয়। মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপানের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম প্রভৃতি মৌল উপাদন প্রয়োজন। পুকুর থেকে মাছ আহরণ, পানি পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক কারণে এসব উপাদান অপচয় হয়। তাই এসব উপাদান পূরণ করার জন্য পুকুরে সার ব্যবহার করা হয়। সার সাধারণত দুই প্রকার হতে পারে। যেমন– জৈব সার এবং অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার : প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে যে সব সার পাওয়া যায় তাকে জৈব সার বলে। যথা– হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, সবুজ সার, কম্পোস্ট ইত্যাদি।

অজৈব সার : ইউরিয়া. টি.এস.পি এবং এম পি ইত্যাদি রাসায়নিক বা অজৈব সার। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ (ফাইটোপ্লাংকটন) প্রচুর পরিমাণে জন্মানোর জন্য টি.এস.পি এবং ইউরিয়া পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হয়। সঠিকভাবে পুকুরে সার প্রয়োগ করা হলে অনেক বেশি পরিমাণে মাছ উৎপাদন সম্ভব।

পুকুরে সার প্রয়োগ মাত্রা

মাটির গুণাগুণের উপর পুকুরে সার প্রয়োগ মাত্রা নির্ভর করে। বেলে ও এঁটেল মাটির দো-আঁশ মাটির চেয়ে বেশি সার দিতে হয়। যেসব পুকুরের মাটিতে বালির ভাগ বেশি সেসব পুকুরে বেশি পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা হলে বাঞ্চিত ফল লাভ করা যায়। খুব পুরানো পুকুরে সার কম লাগে। কারণ এসব পুকুরের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকে। আবার নতুনভাবে মাটি কেটে তৈরি করা পুকুর বা সংস্কার করা পুকুরে জৈব সার বেশি প্রয়োগ করতে হয়। সার দুটি পর্যায়ে পুকুরে প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম পর্যায়ে পুকুর প্রস্তুত করার সময় অর্থাৎ পোনা ছাড়ার পূর্বে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পোনা ছাড়ার পরবর্তী সময়ে।

পুকুর প্রস্তুতকালীন সময়ে সার ব্যবহার

সারের নাম	পরিমাণ (প্রতি শতাংশ)
গোবর	৫-৭ কেজি
মুরগীর বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টি.এস.পি	৭৫ গ্রাম

পুকুরে পোনা মজুদ পরবর্তী দৈনিক সার ব্যবহার

সারের নাম	পরিমাণ(প্রতি শতাংশ)
গোবর	১৫০-২০০ গ্রাম
মুরগির বিষ্ঠা	৫০-১০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৪-৫ গ্রাম
টি.এস.পি	১-২ গ্রাম
এম.পি	০.৫-১.০ গ্রাম

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : পুকুরে সার প্রয়োগ করার পর পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য যথাযথ পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কারণ প্রাকৃতিক এসব খাদ্য মাছের প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচিত। প্রাকৃতিক খাদ্যসমৃদ্ধ পানির রং সাধারণত সবুজ থেকে বাদামি হয়। একটি স্বচ্ছকাঁচের গ্লাসে পুকুর থেকে পানি নিয়ে দিনের আলোয় গ্লাসটিকে বাইরে থেকে লক্ষ্য করতে হবে। যদি পানির মধ্যে ছোট পোকার মত দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে। পোকার ঘনত্ব বা পরিমাণের উপর নির্ভর করে খাদ্য উৎপাদনের হার সনাক্ত করা সম্ভব। পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাবারের উপস্থিতি অন্যভাবেও পরীক্ষা করা যায়। পুকুরের পানিতে উপর থেকে কনুই পর্যন্ত হাত

ডুবিয়ে উপর থেকে তালু লক্ষ্য করতে হবে, যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য আছে।

কীট-পতঙ্গ দমন : পুকুরে সার দেওয়ার পর ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ বা পোকামাকড় জন্মাতে পারে। পোনা মাছ মজুদের পূর্বে প্রতি শতাংশ ৩০ সে.মি. গভীরতার পানির জন্য ডিপ্টেরেক্স ১২ গ্রাম বা সুমিথিয়ন ৩ গ্রাম হারে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এগুলো অবশ্যই দমন করতে হবে। মাছ চাষের জন্য এগুলো ক্ষতিকর।

৩। পোনা মজুদ : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মালে পোনা মজুদ করতে হবে। পোনার আকার ৮-১২ সে.মি. হলে ভালো হয় কারণ এতে মৃত্যু হার খুব কম থাকে।

পুকুরের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী পোনা ছাড়ার হার কিছু কম-বেশী হতে পারে। সাধারণত নিম্নোক্ত হারে পোনা ছাড়া যায়–

প্রজাতির নাম	**প্রতি শতাংশে সংখ্যা**
কাতলা	৪-৬ টি
সিলভার কার্প	৭-৮ টি
রুই	৫-৬ টি
মৃগেল	৪-৫ টি
মিরর কার্প/কমন কার্প	২-৩ টি
গ্রাস কার্প/সরপুঁটি (জলজ উদ্ভিদ থাকলে)	২-৩ টি
	মোট : ২৪-৩১ টি

৪। পোনা অবমুক্ত করার পদ্ধতি- পোনা হাঁড়ি বা পলিথিন ব্যাগে পরিবহন করা হলে পলিথিন ব্যাগের মুখ খোলার আগে পুকুরের পানিতে ২০-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর ব্যাগের মুখ খুলে ধীরে ধীরে ব্যাগের পানি পুকুরে এবং পুকুরের পানি ব্যাগে ভরতে হবে। এতে ব্যাগের পানি ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা যখন সমান হবে তখন পাত্র বা ব্যাগের মুখ পানিতে কিছুটা ডুবিয়ে কাত করে সমস্ত পোনা পুকুরে অবমুক্ত করতে হবে।

সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : মাছের খাদ্য হিসেবে বাইরে থেকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকে সম্পূরক খাদ্য বলে। খৈল, কুঁড়া ও ভুষি ইত্যাদি সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মাছের খাদ্য গ্রহণের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সেজন্য সকাল ও বিকেল অর্থাৎ দিনে দুবার খাদ্য সরবরাহ করা উচিত।

মাছের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি পরীক্ষা- জাল টেনে মাছ ধরে পরীক্ষা করতে হবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে পুকুরের পানিতে যেন লাল আস্তরণ জমা না পড়ে।

মাছ আহরণ : মাছ আহরণ মাছ চাষের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। মাছ নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর খাদ্যগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও দেহের বৃদ্ধি সাধন হয় না। সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ে আহরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রুই, কাতলা ও মৃগেল ৮-১২ মাসের মধ্যে ৭০০ গ্রাম থেকে ১.৫ কেজি, সিলভার কার্প, মিরর কার্প ও গ্রাসকার্প ৬-৭ মাসের মধ্যেই প্রায় ১.৫ কেজি হয়। পোনা মজুদের ৬-৭ মাসের মধ্যেই বড় হওয়া মাছ বিক্রি করতে হয়। মাছ বিক্রি করার পর পুকুরে সমপরিমাণ বড় পোনা ছাড়া উচিত। এতে মাছের উৎপাদন অনেক বেশি হয়।

সারমর্ম

- নিবিড় পদ্ধতির মাছ চাষে প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করা হয়।
- কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, মিরর কার্প প্রভৃতি মাছের একত্রে চাষ করাকে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ বলে।
- মাছ চাষের জন্য পুকুরে চুন ও সার প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করতে বোঝায়?
(ক) অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন
(খ) মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের পূর্ণ ব্যবহার
(গ) বিভিন্ন প্রজাতির মাছ একত্রে ব্যবহার
(ঘ) প্রযুক্তির সর্বাধিক উৎপাদন।

২। পুকুরের স্থান কেমন হওয়া উচিত?
(ক) ঝোপঝাড় পূর্ণ (খ) বাড়ি থেকে দূরে
(গ) পাড়ে যেন গাছ থাকে (ঘ) খোলামেলা ও বাড়ির পাশে

৩। মজুদ পুকুরে পানির গভীরতা কত হলে ভালো?
(ক) ৫-৬ মিটার (খ) ৪-৫ মিটার
(গ) ৪-৬ মিটার (ঘ) ২-২.৫ মিটার

৪। কোনগুলো রাক্ষুসে মাছ?
(ক) রুই, কাতলা, মৃগেল (খ) শোল, বোয়াল, টাকি
(গ) মলা, ঢেলা, চেলা (ঘ) কই, শিং, মাগুর

পাঠ ৯.৩ : কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- একই পুকুরে কার্প ও গলদা চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

কার্প জাতীয় মাছের সংগে চিংড়ির একত্রে একই জলাশয়ে চাষ করাকে কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ বলা হয়। এইপদ্ধতিতে পুকুরে কার্প ও চিংড়ি একত্রে চাষ করে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়। এতে জলাশয়ের পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং আর্থিকভাবে লাভবানও হওয়া যায়।

নিচে কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি পর্যায়েক্রমে বর্ণনা করা হলো–

পুকুর প্রস্তুতি : এক্ষেত্রে সাধারণ মাছ চাষের মতোই পুকুরকে প্রস্তুত করতে প্রয়োজন। চিংড়ি চাষের পুকুরে পানিতে বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে পুকুরের পানি বদল করতে হয়। পুকুরে গভীরতা ১-১.৫ মিটার হওয়া ভালো।

পাড় ও তলা মেরামত : পাড় ভাঙা থাকলে তা যথাযথভাবে মেরামত করতে হবে। পাড়ে বড় গাছ না রাখাই ভালো। তলদেশ সমান করে নিতে হবে। নতুবা জাল টানতে অসুবিধা হয়।

রাক্ষুসে মাছ অপসারণ : পুকুরে বার বার জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে অথবা রোটেনন বিষপ্রয়োগে মাছ মারা যায়।

চুন প্রয়োগ : মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চুন। সাধারণত শতাংশ প্রতি ১ কেজি চুন ছিটাতে বা পানিতে গুলে দিতে হবে। চুন পানিকে শোধন করে এবং পানিতে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে।

সার প্রয়োগ : চুন দেওয়ার ৬-৭ দিন পর জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। শতাংশ প্রতি ৩-৫ কেজি গোবর বা হাঁস মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে দিতে হয়। আবার ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টি.এস.পি এবং ২৫ গ্রাম পটাশ পানিতে গুলে দিতে হবে। সার দেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে পুকুরের পানির রং সবুজ হলে প্রাকৃতিক খাবার আছে বুঝতে হবে। পুকুরের পানিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতিকেই প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। এবার পুকুরে মাছ অবমুক্ত করার জন্য তৈরি হয়েছে।

পোনা মজুদ : হেক্টর প্রতি ৭,০০০-১০,০০০ টি গলদা, সিলভার কার্প ও কাতলা ১০০০ টি এবং ৫০০০ টি রুই, ৩০ টি গ্রাস কার্প, ২০ টি মৃগেল ও কমন কার্প পোনা মজুদ করতে হবে। তবে মৃগেল ও কমন কার্প মাছ না দিলেও চলে। কারণ চিংড়ি তলদেশের বা নিচের স্তরের খাবার খায়।

খাদ্য প্রয়োগ : মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। চিংড়ির খাবারের মধ্যে ঝিনুক চূর্ণ, আর্টেমিয়া, ফিশমিল, লবণ ও ভিটামিন অবশ্যই থাকতে হবে। চিংড়ির আমিষ জাতীয় খাবার প্রয়োজন।

আশ্রয় ব্যবস্থা : চিংড়ির দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোলস পরিবর্তন করে। এ সময় চিংড়ি অত্যন্ত দুর্বল ও নাজুক অবস্থায় থাকে। এসময় চিংড়ি আশ্রয় খোঁজে। এজন্য এসময় পুকুরে কিছু পাতাবিহীন ডালা-পালা পুঁতে রাখতে হবে। পুকুরে কিনারে কলা গাছ ফেলে রাখাও যায়।

পরিচর্যা : কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষের পুকুরে কিছু পরিচর্যা করা প্রয়োজন। নিচে তার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো-

- মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাসে দুবার জাল টেনে দেখতে হবে।
- চিংড়ি নিয়মিত খাবার গ্রহণ করছে কিনা তা যথাযথভাবে পর্যাবেক্ষণ করতে হবে।
- চিংড়ি সকাল বা অন্য কোন সময় পুকুরের কিনারে বা পানির উপরে এসে খাবি খেলে অক্সিজেন অভাব ঘটেছে বলে বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে জাল টেনে, বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি নাড়াতে হবে।

আহরণ : উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় চাষ করলে ৬-৭ মাসে চিংড়ি বাজারজাতকরণের উপযুক্ত হয়। এ সময় ১০-১৫ টিতে ১ কেজি ওজন হলে চিংড়ি আহরণ করতে হবে। এভাবে বড় আকারের ও ওজনের মাছ ধরে ফেলতে হবে।

সারমর্ম

- চিংড়ির দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোলস পাল্টায়। তাই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিংড়ির আমিষ জাতীয় খাবার প্রয়োজন। তাই ঝিনুক চূর্ণ, আর্টিমিয়া, ফিশমিল, লবণ, ভিটামিন প্রভৃতি চিংড়ির খাবারের সঙ্গে পরিমিত পরিমাণে থাকতে হবে।
- চিংড়ির পুকুরে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাই মাঝে মাঝে পানি বদল করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। চিংড়ি পুকুরের কোন খাবার খায়।

(ক) মধ্য স্তরের (খ) উপরের স্তরের
(গ) তলদেশের (ঘ) ভাসমান উদ্ভিদ

২। চিংড়ির দ্রুত বৃদ্ধির জন্য কোন খাবার প্রয়োজন?

(ক) উদ্ভিদ জাতীয় (খ) আমিষ জাতীয়
(গ) চর্বি জাতীয় (ঘ) শ্বেতসার জাতীয়

ব্যবহারিক

বিষয় ১ : পুকুরে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকণা পর্যবেক্ষণ

এই অনুশীলনী সমাপ্ত করার পর আপনি–

- পুকুরে মাছ চাষের সুবিধার্থে জলজ উদ্ভিদ শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের অবস্থান অনুযায়ী জলজ উদ্ভিদকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ভাসমান জলজ উদ্ভিদ : যেমন– কচুরিপানা, ক্ষুদি পানা, শেওলা ইত্যাদি।

২। উদ্ভিদের পাতা পানির উপরে থাকে বা লতানো উদ্ভিদ : যেমন– শাপলা, শালুক ইত্যাদি।

৩। নিমজ্জমান উদ্ভিদ : ঝাঁঝি, পাতা ঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি।

৪। পুকুরে, কিনারায় উদ্ভিদ : কলমিলতা, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কচু ইত্যাদি।

উপকরণ : বালতি, ট্রে, কাস্তে বা ছুরি, লম্বা লাঠি, ট্রে, নোট খাতা ও পেন্সিল, পুকুরের পানি, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, বিকার ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১। বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ আছে এমন পুকুরে যান। ভাসমান জলজ উদ্ভিদ, নিমজ্জিমান, লতানো এবং পুকুরে কিনারার উদ্ভিদ কাস্তে বা ছুরি দিয়ে প্রায় গোড়া থেকে উপড়ে ফেলুন। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে জলজ উদ্ভিদগুলোকে পাড়ের কাছে টেনে আনুন। উদ্ভিদগুলো সংগ্রহের সময় খেয়াল রাখতে হবে, কোন উদ্ভিদ কোন শ্রেণীভুক্ত। উদ্ভিদগুলো একটি বালতিতে রাখুন এবং পরীক্ষাগারে আনুন।

২। পুকুরের পানি এনে প্লাংকটন নেটে ঢালুন। এবার প্লাংকটন নেটের শেষ প্রান্তে জমাকৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো বিকারে ঢালুন।

৩। এবার বিকারের পানি ২/১ ফোঁটা স্লাইডে ঢালুন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ কণা ও প্রাণিকণা পর্যবেক্ষণ করুন। ব্যবহারিক খাতায় ছবি অংকন করে নাম লিখুন।

৪। বড় জলজ উদ্ভিদগুলো তুলে এনে ৪ শ্রেণীতে বিভাগ করুন।

৫। ট্রেতে রাখা জলজ উদ্ভিদগুলো দেখে আপনার ব্যবহারিক খাতায় উদ্ভিদগুলো অংকন করুন এবং নামগুলি লিখুন।

সাবধানতা : বড় এবং গভীর পুকুরে মাঝখান হতে জলজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে হলে নৌকা ব্যবহার করুন। এ ক্ষেত্রে লম্বা লাঠি এবং জালের প্রয়োজন হবে না।

বিষয় ২ : পুকুরে সার ও চুন প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয়

এ অনুশীলনী শেষে আপনি–

- পুকুরের আকার অনুযায়ী সার ও চুনের মাত্রা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সার ও চুন বিধি মোতাবেক প্রয়োগ করতে পারবেন।

উপকরণ :

১ ইউরিয়া, টি.এস.পি. ও এম.পি সার। ২। পাথুরে চুন। ৩। বালতি ৪ ।ছোটড্রাম-১টি, হাফড্রাম -১টি ৫। ছোট মগ ১টি ৬। মাপার ফিতা ৭। খাতা, পেন্সিল ও স্কেল।

কাজের ধাপ

১। নিকটস্থ কোন পুকুরে যান। মিটার ফিতার সাহায্যে পুকুরের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থের মাপ দিন।

২। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করুন। গুণফলকে ৪০ দিয়ে ভাগ করে শতাংশে আয়তন নির্ণয় করুন। ১ শতাংশ = ৪০ বর্গমিটার (প্রায়)।

৩। শতাংশ প্রতি ইউরিয়া ১৫০ গ্রাম, টি.এস.পি ৫০ গ্রাম, পটাশ ১০ গ্রাম এবং পুনরায় কেজি হিসাবে পরিমাণ নির্ণয় করুন।

৪। ব্যবহারিক খাতায় ছক আকারে পুকুরের আয়তন, চুন ও সারের নাম ও পরিমাণ লিখুন।

উদাহরণ : মনে করুন পুকুরের দৈর্ঘ্য-৪০ মিটার ও প্রস্থ ২৫ মিটার

পুকুরের আয়তন–৪০× ২৫ = ১০০০ বর্গমিটার
= ১০০০ বর্গমিটার ÷ ৪০
= ২৫ শতাংশ।

(ক) মোট ইউরিয়া সারের পরিমাণ = ১০০ গ্রাম × ২৫
= ২৫০০ গ্রাম
= ২.৫ কেজি

(খ) মোট টি.এস.পি সারের পরিমাণ = ৫০ গ্রাম × ২৫
= ১২৫০ গ্রাম
= ১.২৫ কেজি

(গ) মোট এম.পি সারের পরিমাণ = ১০ গ্রাম × ২৫
= ২৫০ গ্রাম
= ০.২৫ কেজি।

(ঘ) মোট চুনের পরিমাণ = ১ কেজি × ২৫ = ২৫ কেজি

সারের পরিমাণ (কেজি)

পুকুরের দৈর্ঘ্য (মিটার)	পুকুরের প্রস্থ (মিটার)	আয়তন (শতাংশ)	ইউরিয়া	টি.এস.পি	এম.পি	চুন	মন্তব্য
৪০ মিটার	২৫	২৫	২.৫	১.২৫	০.২৫	২৫	৪০ বর্গমিটার =১ শতাংশ এবং ১০০০গ্রাম= ১ কেজি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। মৌসুমী পুকুর বলতে কি বুঝায় বিস্তারিতভাবে লিখুন?
২। পুকুরের পানির রং সবুজাভ বা বাদামি রং ধারণ করে কেন?
৩। সরপুঁটি মাছ কিভাবে আহরণ করতে হয়?
৪। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ বলতে কি বুঝায়?
৫। কার্প ও চিংড়ির সমন্বিত চাষ বলতে কি বুঝায়?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৯.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩ : ১। গ ২। খ